বীর শহীদ

রাইফা

জন্ম তারিখ:	১৫ জুন, ২০১৮
শাহাদাতের তারিখ:	২০ জুলাই, ২০২৪
বিভাগ:	ঢাকা
জেলা:	কিশোরগঞ্জ

শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

পেশা : ছাত্রী, (৬ বছরের শিশু)

শাহাদাতের স্থান : তারাবো, বিশ্বরোড, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ

শাহাদাতের বিস্তারিত ঘটনা ও ইতিহাস

একটি নিষ্পাপ ফুলের নির্মম বিদায়জন্ম ও বেড়ে ওঠা

২০১৮ সালের ১৫ জুন, কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার পূর্ব পুরুড়া গ্রামে এক নতুন প্রাণের আগমন ঘটে। গরিব কিন্তু প্রাণবন্ত এক পরিবারে জন্ম নেয় ফুটফুটে এক কন্যাশিশু নাম রাখা হয় রাইফা। জন্মের প্রথম দিন থেকেই যেন পরিবারটিতে নতুন আলো নেমে আসে। তার মা-বাবার ক্লান্ত মুখেও হাসির রেখা ফুটে ওঠে ছোট্ট মেয়েটির নিষ্পাপ মুখ দেখে। পিতা মো: বাবুচান ঢাকার অলিগলিতে ফেরি করে মালামাল বিক্রি করেন। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করে কষ্টের বিনিময়ে যা আয় হয়, তা দিয়েই চলে তাদের দশজনের পরিবারের জীবন। মা সেলিনা খাতুন মেয়ে রাইফাকে কোলে রেখে, কখনো কখনো রাজমিস্ত্রীর যোগালির কাজেও যোগ দিতেন। সংসারের অভাব-অনটনের মাঝেও রাইফার চোখে-মুখে সবসময় ঝলকে পড়ত আনন্দের আলো। রাইফা ছিল এই পরিবারে সবচেয়ে ছোট। নয় ভাইবোনের মধ্যে সে যেন ছিল পরিবারের প্রাণকেন্দ্র। বড় ভাই আজিজুল, দেলওয়ার, রিয়াদ যারা নিজেরা দিনমজুরি কিংবা পোশাক কারখানায় কাজ করে সংসারের হাল ধরেছে, তারাও ছোট বোনের জন্য সময় করে আদর ভালোবাসা বিলিয়ে দিত। কাউসার আর আলিমুন ছিল রাইফার খেলার সাথী, প্রতিদিন দুপুরবেলা উঠানে তাদের খেলাধুলা, হাসাহাসিতে মাতিয়ে রাখত পুরো বাড়ি। আর বড় বোন সুরমা, দিনা, সুবর্ণা তিনজনই বিবাহিত। তবে সাজগোজ, গল্পশোনা আর আদরে যেন তারা ছিল রাইফার সবচেয়ে আপন।

পাড়ার লোকজন জানতেনএই মেয়েটি একদিন অনেক দূর যাবে। তার চঞ্চলতা, কোমলতা আর হৃদয়গ্রাহী হাসি পাড়ার প্রত্যেকের মন জয় করে নিয়েছিল অল্প সময়েই। স্কুলে যাওয়া তখনো শুরু হয়নি তার, তবে প্রতিদিন ভাইদের বইখাতা নিয়ে বসে আঁকিবুঁকি করত। সবাই বলত, "রাইফা অনেক মেধাবী হবে একদিন।" অভাবের মাঝে বেড়ে উঠলেও, তার মনোজগৎ ছিল বিস্ময়ে ভরা, স্বপ্নে জর্জরিত। মায়ের আঁচল ধরে বাজারে যেত, বাবার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা রাস্তার ধারে বসে থাকত। এইসব স্মৃতি এখন যেন পরিবারের হৃদয়ে ছুরির মতো বিঁধে থাকে। এই শিশু রাইফা ছিল না শুধুই এক সন্তান। সে ছিল বাবার পরিশ্রমের প্রতিদান, মায়ের চোখের মুক্তো, ভাইবোনদের হাসির কারণ। দরিদ্র কিন্তু ভালোবাসায় পূর্ণ একটি পরিবারে, সে ছিল এক অনুপম আশীর্বাদ।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

২০২৪ সালের ২০ জুলাই, শুক্রবার। সময়টা ছিল সকাল থেকে দুপুরের মাঝামাঝি। জায়গা তারাবো, বিশ্বরোড, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। চারদিকে থমথমে পরিবেশ, ভয় আর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল প্রতিটি অলিতে-গলিতে। বৈষম্যহীন সমাজ, গরিবের অধিকার, মজুরের ন্যায্য মজুরি, আর রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে ফেটে পড়ে জনসাধারণ। মানুষের বুকে দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ যেন রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে আগুনের মতো। সেদিনের মতো সাধারণ সকাল, কিন্তু রাইফার জন্য তা হয়ে দাঁড়ায় জীবনের শেষ সকাল। মাত্র ছয় বছরের শিশু রাইফা, তার মায়ের হাতে রান্না করা গরম ভাত-ডাল খেয়ে, নিজের স্বভাবসুলভ খেলাধুলার ভেতরেই বেরিয়ে পড়ে ঘরের সামনে। অজান্তেই পৌঁছে যায় বিশ্বরোডের এক পাশে। মানুষজনের ভিড়, স্লোগানের ধ্বনি, আর উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ তাকে কৌতূহলী করে তোলে। শিশু মন তো আর বুঝে না রাজনীতি, আন্দোলন কিংবা দমনপীড়ন। এমন সময় শুরু হয় ভয়াবহ হামলা। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে সশস্ত্র পুলিশ ও সরকারি দলের মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীরা। নির্বিচারে ছুড়তে থাকে এলোপাথাড়ি গুলি। আকাশ-বাতাস কেঁপে ওঠে গুলির শব্দে। মানুষের চিৎকারে রাজপথ যেন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। গুলির লক্ষ্য শুধু বিক্ষোভকারীরা নয়, বরং যে কাউকে বয়স-লিঙ্গ বিবেচনা ছাড়াই। এভাবেই এক টার্গেটেড গুলি এসে বিদ্ধ করে ছোট্ট রাইফাকে। কোমল শরীরটা মুহূর্তেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তার সাদা জামা ভিজে যায় লাল রক্তে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। চারদিকে তখন কেবল চিৎকার, আতঙ্ক আর স্তব্ধতা। কেউ ভাবতেও পারেনি, শিশুরাও এভাবে গুলিবিদ্ধ হতে পারে! তড়িঘড়ি করে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয় রাইফাকে। ডাক্তাররা চেষ্টা করেন সবকিছু স্যালাইন, অক্সিজেন, সেলাই, ইনজেকশন। মা সেলিনা তখন ছুটে চলেছেন কন্যার মাথায় পানি দিয়ে জাগানোর আশায়, বাবা বাবুচান শুধু কান্না করেই যাচ্ছেন, আর বলছেন "আমার মেয়ে চোখ তোলে না কেন!" কিন্তু সব আশার অবসান ঘটে বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে, যখন চিকিৎসক জানান রাইফা আর বেঁচে নেই। নিথর হয়ে গেছে তার নিষ্পাপ দেহ। সেদিন শুধু একটি শিশু মারা যায়নি। একটি পরিবার ভেঙে যায়, সমাজ বিবেকহীনতার চূড়ায় পৌঁছায়, রাষ্ট্র তার মানবিকতা হারায়। এরপর রাইফার নিথর দেহ গ্রামে ফিরিয়ে আনা হয়। যে গ্রামে সে জন্মেছিল, হেঁটেছিল ছোট পা ফেলে, যেখানে ভাইদের সঙ্গে খেলত, মায়ের কোল জুড়ে থাকত সেই গ্রামই তাকে এবার গ্রহণ করে চিরতরে। হাজারো মানুষের কান্নার মাঝে জানাজা হয়। কবরস্থানের মাটিতে যখন তাকে সমাহিত করা হয়, তখন আকাশ ভারী হয়ে ওঠে।

রাইফার ছোট্ট কবরটি যেন আজও প্রশ্ন তোলে- কোন অপরাধে এই শিশুটিকে হত্যা করা হলো? “শিশুর রক্ত দিয়ে কী নির্মাণ করছে এই রাষ্ট্র?” রাইফার কবর শুধু কবর নয়, একটা কালো

সময়ের নীরব সাক্ষ্য। ইতিহাসের পাতায় লেখা রইল শিশু রাইফার রক্তাক্ত বিদায়, এক অবর্ণনীয় আওয়ামী নৃশংসতার দলিল।

শহীদ শিশু রাইফা শুধু একটি নাম নয়, বরং একটি কালো দিনের নির্মম চিত্র। তাকে হত্যা করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত দমন-পীড়নের এক কুখ্যাত অধ্যায়ে। তার রক্ত যেন বাংলার স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও মানবিকতা পুনরুদ্ধারের আহ্বান হয়ে বয়ে চলে। একটি রাষ্ট্র তখনই ব্যর্থ হয়, যখন সে নিজের ভবিষ্যৎশিশুদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। রাইফার মৃত্যু আমাদের সেই ব্যর্থতা, সেই অন্যায়ের দলিল। এই হত্যাকাণ্ডের বিচারই হতে পারে ভবিষ্যতের শিশুদের নিরাপত্তার পথ।

রাইফা না থাকায় প্রতিটি সকাল, প্রতিটি সন্ধ্যা কেটে যায় বিষাদের ছায়ায়

রাইফা যখন মারা গেল, তখন শুধু একটি শিশুর প্রাণ নিভে যায়নি একটি পরিবারের হাসি, স্বপ্ন, আশ্রয়, বেঁচে থাকার অর্থও যেন চিরতরে মুছে গেল। তার মৃত্যুর পর এক গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় রাইফার পরিবার। যে পরিবার প্রতিদিন হাজার কষ্টের মাঝেও এক শিশুর

হাসিতে প্রাণ পেত, এখন সেখানে শুধু শোক আর স্তব্ধতা। মা সেলিনা খাতুন, যিনি কখনো রাজমিস্ত্রীর যোগালি হয়ে, কখনো ইট-বালুর টুকরি বইয়ে সংসারে সাহায্য করতেন, সেই মা আজ আর কাজে যেতে পারেন না। সকাল হলে বুকের ভেতর ফাঁকা একটা জায়গা ছটফট করতে থাকে যেখানে একসময় রাইফা ছিল। মেয়ের মুখটা ভুলতে পারেন না, তার শেষ হাসিটা, শেষ আদরের ছোঁয়াটা যেন মায়ের সারা শরীরে খচখচ করে। রান্নার সময়, খাওয়ার সময়, রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় সবসময়ই যেন কানে বাজে রাইফার ডাকে ওঠা সেই কোমল স্বর। পিতা বাবুচান, যিনি ঢাকার অলিগলিতে ফেরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন, এখন আর ঢাকায় ফিরতে চান না। ঢাকার বাতাসেই যেন মিশে আছে মেয়ের কান্না, পুলিশের গুলির শব্দ, হাসপাতালের করিডোরে মৃত্যুর ঘোষণা। তিনি এখন গ্রামের বাড়িতেই থাকেন, নিঃশব্দে। চুপচাপ বসে থাকেন উঠোনের এক কোণে, যেখানে রাইফা একদিন খেলেছিল, হেসেছিল। সংসারে এখন আয় বলতে প্রায় কিছুই নেই। বাবার ফেরির কাজ বন্ধ, মায়ের হাত চলেও মন চলে না। বড় ছেলে আজিজুল, দেলওয়ার আর রিয়াদ কেউ দিনমজুরি করে, কেউ পোশাক কারখানায় অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করে সামান্য আয় করে সংসার চালানোর চেষ্টা করছে। অনেকদিনই রাতে রান্না হয় না, সকালে যা থাকে তা দিয়েই চলে দিনের হিসাব। কখনো হয়তো পুরো পরিবার একসাথে বসে খেতে পারে না, শুধু অভাবের টানে নয় মন খারাপের ভারে। সুবর্ণা, দিনা, কাউসার আর আলিমুন যারা রাইফার সঙ্গে হাসত, খেলত, ঝগড়া করত, তারা এখন কেবল স্মৃতির জোয়ারে বাঁচে। উঠোনে খেলতে গেলে মনে পড়ে এখানে একদিন রাইফা লুকিয়ে পড়েছিল, কিংবা দাদা-দিদির কোলে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কেউ কেউ রাতে ঘুম ভেঙে উঠে বলে, "রাইফা কোথায়?" এ কথা শুনে পুরো বাড়ি আবার ভারী হয়ে ওঠে কান্নায়। পরিবারের হাসি যেন চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে। এক শিশুর মৃত্যুর মাধ্যমে শুধু একটা জীবন নয়, হারিয়ে গেছে দশটা জীবনের শান্তি। রাইফার রক্তে রাঙানো স্মৃতি আজও তাদের সকাল, বিকেল, সন্ধ্যা, রাত সবটা সময় ঢেকে রেখেছে। এই পরিবারের প্রতিটি সদস্য এখন যেন বেঁচে আছেন শুধুই একটি রক্তাক্ত স্মৃতিকে বুকে নিয়ে, রাষ্ট্র আর সমাজের নির্মমতা এবং ন্যায়হীনতার বোঝা মাথায় নিয়ে।

শহীদ সম্পর্কে প্রতিবেশীদের অনুভূতি

রাইফার মৃত্যু কেবল তার পরিবারকেই নয়, স্তব্ধ করে দিয়েছিল গোটা পাড়া-প্রতিবেশীকেও। পূর্ব পুরুড়া গ্রামের প্রতিটি মানুষ যেন এক সন্তান হারানোর বেদনায় কাতর হয়ে পড়ে। কেউ বিশ্বাসই করতে পারেনি যে এই নিষ্পাপ, হাসিখুশি, খুনসুটিতে ভরা শিশুটি আর নেই। গ্রামের বাতাস পর্যন্ত ভারী হয়ে উঠেছিল কান্নায়।

কুতুব মিয়া যিনি রাইফাদের পাশের বাড়িতে থাকেন, জানালেন তার দগ্ধ হৃদয়ের কথা:

"ছোট্ট শিশু রাইসাকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে আওয়ামী সন্ত্রাস খুনি শেখ হাসিনা জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়েছে। এমন নির্মমতা, এমন বর্বরতা আমরা কল্পনাও করিনি। কেবল একটি শিশু যার হাতে ছিল না কোনো অস্ত্র, যার মুখে ছিল না কোনো প্রতিবাদ তার দিকেও যদি গুলি চলে, তাহলে আর কে নিরাপদ? আমি এই শিশু হত্যার কঠোর বিচার চাই। এই রক্তের ঋণ রাষ্ট্রকে শোধ করতেই হবে।" আরেক প্রতিবেশী, সবুজ চোখ মুছতে মুছতে বললেন:

"আমি স্তব্ধ। বাকরুদ্ধ। এতটুকু শিশুর কি অপরাধ ছিল? রাইফা তো শুধু খেলতে গিয়েছিল, সে জানতও না আন্দোলন কী, গুলি কাকে বলে। তাহলে কেন পুলিশ তাকে গুলি করলো? কেমন করে তারা পারলো? এই রাষ্ট্রের কাছে আমরা কী চাইব, যখন সে আমাদের সন্তানদের রক্ষা করতে পারে না? আমি রাইফা হত্যার বিচার চাই। শুধু বিচার নয় এই রক্তের ইতিহাস যেন লিপিবদ্ধ হয় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।"

এভাবে প্রতিবেশীরা প্রত্যেকে নিজের মতো করে হারিয়েছেন এক আত্মীয়তাসম শিশুকে। প্রতিটি স্মৃতি, প্রতিটি কথায় রাইফা আজও বেঁচে আছে। তার নিষ্পাপ মুখ যেন ঘুরে বেড়ায় পাড়ার অলিতে-গলিতে। কিন্তু তাদের ভেতরে সবচেয়ে বেশি বারবার উচ্চারিত হচ্ছে একটিই বাক্য "আমরা এই শিশু হত্যার বিচার চাই।" শহীদ শিশু রাইফা শুধু একটি নাম নয়, বরং একটি কালো দিনের নির্মম চিত্র। তাকে হত্যা করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত দমন-পীড়নের এক কুখ্যাত অধ্যায়ে। তার রক্ত যেন বাংলার স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও মানবিকতা পুনরুদ্ধারের আহ্বান হয়ে বয়ে চলে। একটি রাষ্ট্র তখনই ব্যর্থ হয়, যখন সে নিজের ভবিষ্যৎ শিশুদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। রাইফার মৃত্যু আমাদের সেই ব্যর্থতা, সেই অন্যায়ের দলিল। এই হত্যাকাণ্ডের বিচারই হতে পারে ভবিষ্যতের শিশুদের নিরাপত্তার পথ।

এক নজরে অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা

১. শহীদ রাইফার পরিবারকে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান

২. পিতা-মাতার জন্য মাসিক ভাতা চালু

৩. পরিবারের বসতঘর পুনঃনির্মাণ বা মেরামতের ব্যবস্থা

৪. ছোট ভাইবোনদের শিক্ষাবৃত্তির আয়োজন

৫. বড় ভাইদের কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি

৬. মা সেলিনা খাতুনের জন্য বিকল্প আয়ের উৎস গড়ে তোলা

৭. পরিবারের জন্য সরকারিভাবে খাদ্য সহায়তা ও চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিতকরণ

৮. শহীদের নামে স্থায়ী স্মৃতি সংরক্ষণে সরকারি পদক্ষেপ

৯. বিচার ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে আইনি সহায়তা প্রদান

১০. পরিবারকে নিরাপত্তা ও মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান

এক নজরে শহীদের প্রোফাইল

শহীদের পূর্ণ নাম : রাইফা

জন্ম তারিখ : ১৫/৬/২০১৮

জন্মস্থান : কিশোরগঞ্জ

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: পূর্ব পুরুড়া, ইউনিয়ন: সহশ্রাম ধূলদিয়া, থানা: কটিয়াদি, জেলা: কিশোরগঞ্জ

পিতার নাম : মো: বাবুচান, বয়স: ৫৩, পেশা: ফেরিওয়ালা, মাসিক আয়: ১০,০০০,

মায়ের নাম : সেলিনা খাতুন, বয়স: ৪২, পেশা: রাজমিস্ত্রীর যোগালি

পরিবারের সদস্য : ১০ জন, পিতা-মাতা, ভাই: ৫ জন, বোন: ৩ জন

ভাই বোনদের নাম : ১. আজিজুল, পেশা: লেবার, বয়স: ২৫, সম্পর্ক: ভাই

২. দেলওয়ার, পেশা: পোশাক কারখানার শ্রমিক, বয়স:২১, সম্পর্ক: ভাই

৩. রিয়াদ মিয়া, পেশা: রাজমিস্ত্রীর যোগালি, বয়স:১৭, সম্পর্ক: ভাই

৪. কাউসার, বয়স:১২, সম্পর্ক: ভাই

৫. আলিমুন, বয়স: ৮, সম্পর্ক: ভাই

৬. সুরমা, বিবাহিত, সম্পর্ক: বোন

৭. দিনা, বিবাহিত, সম্পর্ক: বোন

৮. সুবর্ণা, বিবাহিত, সম্পর্ক: বোন

ঘটনার স্থান : তারাবো, বিশ্বরোড, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ

আক্রমণকারী : পুলিশ

আক্রমণের ধরণ : পুলিশের গুলি

আহত হওয়ার তারিখ : ২০/৭/২৪, সময়: ১১:০০টা থেকে ১২:০০টা

শহীদ হওয়ার তারিখ : ২০/৭/২৪, সময়: ৪:৩০ মিনিট

শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান : নিজগ্রাম

জানালা যেখান থেকে সে পৃথিবীকে একটু ভিন্ন চোখে দেখতে শিখেছিল। কিন্তু ভাগ্য তাকে বেশি সময় দেয়নি। বইয়ের ব্যাগ নামিয়ে, হাতে তুলে নিতে হয় হাল ধরার ভার। দারিদ্র্য ছিল তার প্রতিদিনের সঙ্গী। তবে সে দারিদ্র্যরে কাছে মাথা নত করেনি। ছোট থেকেই মায়ের আঁচল ধরে বাজারে যাওয়া, বাবার হাত ধরে জমিতে যাওয়া সবই তাকে বাস্তবতা চিনিয়ে দিয়েছিল। খুব কম বয়সেই বুঝে গিয়েছিল, এই পরিবারকে কেউ ভরসা দেবে না, তাকেই হতে হবে আশ্রয়ের প্রতীক। তাই তো হয়তো তার নামের শেষে যুক্ত হয়েছিল 'জীবন' একটি পরিবারের জীবনরেখা হয়ে ওঠার দায়ভারে।

পবিত্র কুরআনের বাণী

তারা তাদের রবের দেওয়া অনুগ্রহে আনন্দিত, এবং যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি তাদের জন্যও তারা সুসংবাদ গ্রহণ করে। (সুরা আলে ইমরান ৩:১৭০)

হাদীস শরীফ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “শহীদদের আত্মা সবুজ পাখির পেটে থাকে।” (সহীহ মুসলিম ১৮৮৭)

দোয়া পাঠ: 1 জন

শহীদের স্মৃতিচিত্র ও ফটো গ্যালারি

realme C53
2025.06.18 16:33